ভূতের বিয়েতে গোপাল ভাঁড়

একদিন দিন ঠিক সন্ধ্যার সময় দাদু এসে বৈঠকাখায় বসতেই নাতি নাতনীরা এসে জড়ো হলো তার কাছে।

দাদু জিজ্ঞাসা করলে—কিরে কি খবর তোদের বল। আজ আবার কিছু ফরমাস আছে নাকি?

পল্টু, বললে—একটা গল্পের ফরমাস আছে দাদু!

দাদু বললে–বেশ, তাহলে সবাই চুপ করে বসো।

দাদুর সম্মতি পেয়ে সবাই তার চার পাশে গোল হয়ে বসলো। দাদু আরাম করে তাকিয়া হেলান দিয়ে গল্প বলতে শুরু করলো।

জ্যৈষ্ঠ মাস। যেমন গরম পড়েছে, তেমনি বিয়েরও হিড়িক পড়েছে। গোপালের এক আত্মীয়ের ছেলের বিয়ে। তাকে বরযাত্রী যেতে হবে। গোপাল কিন্তু যেতে নারাজ। বললে—দেখ ভাই, ও সব নেমন্তন্ন খেয়ে আমার পোষায় না। শরীর খারাপ হয়। তাছাড়া কাজকম্ম রয়েছে। আমার দ্বারা বরযাত্রী যাওয়া হবে না।

বরের বাপ কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে বললে—তুমি না গেলে বিয়েই হবে না। আমি বড় গলায় মেয়ের বাপকে বলেছি যে, তুমি বরযাত্রী যাবে। এখন তুমি যদি না যাও, তাহলে আমাকে কনের বাপের কাছে ছোট হয়ে যেতে হবে।

অনেক অনুরোধ করার পর শেষে রাজী হলো গোপাল ভাঁড়। বিয়ের দিন বিকালে সাজ-গোছ করে গোপাল বরযাত্রী হয়ে রওনা হলো বরের সঙ্গে। গ্রামের মধ্যে গোপালের খুব মান-সম্মান ছিল, তাই অন্যান্য বরযাত্রীদের মধ্যে তাকেই সবাই মাতব্বর বলে মেনে নিল।

গোপালের গ্রাম থেকে বিয়ে বাড়ীটা মাত্র তিন ক্রোশ দূরে। যথাসময় বর গিয়ে পৌছাল মেয়ের বাড়ীতে। মেয়ের বাবা যথাসাধ্য খাতির অভ্যর্থনা করল বরযাত্রীদের। বিশেষ করে গোপালকে বেশী খাতির করতে লাগলো সবাই। কারণ পোপাল হলো মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স্য। তাঁর রাজসভায় কত সম্মান গোপালের। এত আর যা তা লোক নয়। কাজেই সবাই গোপালের খাতির যত্ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ।

নির্দিষ্ট সময়ে শুভলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। তারপর আহারাদি শেষ হতে হতে একটু রাত্রি হয়ে গেল। এবার শোবার পালা। অধিকাংশ বরযাত্রী খাওয়া-দাওয়া শেষ করেই রওনা হলো বাড়ীর দিকে।

গোপাল কিন্তু চব্য-চুষ্য-লেহ্য পেয় খেয়ে পেটটাকে একেবারে জয় ঢাক করে তুলেছিল। কাজেই তার আর নড়বার ক্ষমতা ছিল না। সে কি করবে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো। এমন সময় মেয়ের বাবা এসে বললে—গোপালবাবু। আজকে রাত্রিটা একটু কষ্ট করে গরীবের বাড়ীতে থাকুন।

কাল সকালে চলে যাবেন। গোপালের থাকার ইচ্ছে ছিল ষোল আনা, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে; বললে— না— না, তা কি হয়, বাড়ীতে আমার বিশেষ কাজ আছে।

বাড়ীতে যখন পায়ের ধুলো দিয়েছেন, আজকের রাত্তির টুকু থেকে যান। গোপাল তখন বললে— আচ্ছা তাই হবে। এত করে যখন বলছেন, তখন রাত্তিরটুকু কাটিয়েই যাই।

মেয়ের বাবা গোপালের সম্মতি পেয়ে খুশী হয়ে ভজা-ভজা বলে। চাকরকে ডাকতে লাগলো। ভজা আসতেই মেয়ের বাবা বললে— শীগগীর গোপালবাবুর তামাক সেজে নিয়ে আয়, আর দু খিলি পান দিয়ে যা। কর্তার হুকুমে সঙ্গে সঙ্গে ভজা একটা রেকাবীতে দু'খিলি পান। আর গড়গাঁড়ায় তামাক সেজে দিয়ে গেল। গোপাল তখন আরাম করে বসে পান চিবুতে চিবুতে গড়গড়া টানতে লাগলো।

তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মেয়ের বাবাকে বললে—আমি কিন্তু বাপু এই গরমে ঘরে শুতে পারবো না ; আর কারও সঙ্গে শুতে পারবো না। আমাকে তোমাদের বাইরের দালানে একটা বিছানা করে দাও। গোপালের হুকুম মত মেয়ের বাবা তাদের বাইরের বাড়ীর দালানে রাস্তার ধারে একটি খাটিয়া পেতে বিছানা করে দিল। গোপাল তখন খালি গায়ে ভুড়ি বার করে আরাম করে গড়গড় টানতে লাগলো। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে নাক ডাকাতে শুরু করলো। এদিকে হয়েছে কি! গোপাল যেখানে ঘুমুচ্ছিল, সেখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে মাঠের ধারে একটা ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ীতে ভূতের বিয়ে হচ্ছে।

সব যোগাড় পত্তির ঠিক। বরও এসে গেছে। এমন সময় দেখা গেল বামুন ঠাকুর নেই। বিয়ে দেবে কে? এই নিয়ে ভূতের দল চিন্তায় পড়ে গেল। যার মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল, সে ছিল ভূতের সর্দার।

সব শুনে সে রেগে গিয়ে সব ভূতেদের ডেকে বললে—যেখান থেকে পারিস একটা বামুন ধরে নিয়ে আয়। একটা ভূত ভয়ে ভয়ে বললে—সর্দার! দিনের বেলাতেই এদিকে কেউ আসে না। আমাদের ভয়ে, এত রাত্রে কে আসবে বিয়ে দিতে।

সর্দার বললে— যত টাকা চায় আমি দক্ষিণা দেব। তোরা খোঁজ করে দেখ।

আর একটা ভূত বললে—যত টাকাই দক্ষিণা দাও সর্দার। প্রাণের ভয়ে কেউ এদিকে আসবে না।

এমন সময় লিকলিকে লম্বা হাত পা নাড়তে নাড়তে সেখানে এলো একটা পেত্নী। সেই হলো সর্দারের বৌ, মানে মেয়ের মা। পেত্নীটা এসেই হাত-পা নেড়ে বললে— পাশের গাঁয়ের বামুনপাড়া থেকে একটা বামুন তুলে নিয়ে এসো।

সর্দার বললে—গিন্নী ঠিকই বলেছে, যেখান থেকে হোক একটা বামুন নিয়ে আয়। নইলে বিয়েটা নষ্ট হয়ে যাবে। নিরূপায় হয়ে তখন চারটে ভূত বেরিয়ে পড়লো বামুনের খোঁজে। এদিকে গোপাল রাস্তার ধারে খাটিয়ার উপর শুয়ে দিব্যি নাক— ডাকাচ্ছিল।

ভূতগুলো তখন বামুন খুঁজতে খুঁজতে যাচ্ছিল রাস্তার উপর দিয়ে গোপালের নাক ডাকার শব্দে তারা চমকে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে গোপালের খাটিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

একটা ভূত ফিসফিস করে বললে—বাপরে! কি সাংঘাতিক নাকের ডাকুনি রে বাবা! ভীষণ শক্তিশালী লোক মনে হচ্ছে।

আর একজন বললে—তা তো বটেই। দেখছিস না, কেমন ভুঁড়ি বাগিয়ে শুয়ে আছে ।

তৃতীয় ভূতটা বললে— চেহারাটা কেমন নাদুস-নুদুস দেখছিস। গায়ে যেন তেল গড়িয়ে পড়ছে।

চতুর্থ ভূত বললে—এর মাংস কিন্তু খেতে খুব ভাল হবে।

প্রথম ভুত বললে—এ লোকটা বামুন কিনা তুই কি করে জানলি। প্রথম ভূত বললে—দূর ব্যাটা হাঁদা। বামুন না হলে এমন নাদুস নুদুস চেহারা আর ভুড়ি হয়?

তৃতীয় ভূত বললে—ঠিক বলেছিস। বামুনদেরই এই চেহারা হয়। দ্বিতীয় ভূত বললে—তাহলে একেই নিয়ে যাই চল। সবাই রাজী হয়ে গেল।

তখন প্রথম ভূতটা বলল —জেগে উঠলে চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। তার চেয়ে খাটিয়া শুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে যাই চল। সকলে বলল —খুব ভাল কথা, খাটিয়া শুদ্ধই নিয়ে যাব। এই বলে চারজনে খাটিয়া শুদ্ধ গোপালকে কাঁধে করে হাওয়ার বেগে এসে হাজির হলো তাদের বিয়ে বাড়ীতে। সঙ্গে সঙ্গে পোঁ-পোঁ করে শাঁখ বেজে উঠল।

শাঁখের আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল গোপালের। সে ধড়মড় করে। উঠে বসে চারদিকে চেয়ে দেখে অবাক হলো খুব, এবং সেই সঙ্গে ভয়ও হলো তার। গোপাল দেখলে তার চারপাশে কালো কালো কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে। সারাদেহ কাপড়ে ঢাকা, মুখও দেখা যাচ্ছে না। সবই কেমন যেন আবছা আবছা, কিছুই ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ লোকগুলোর মধ্যে একজন নাকি সুরে বললে— এই, বাড়ীর মধ্যে খবর দে বামুন এসে গেছে। বাড়ীর মধ্যে খবর দিতেই হি-হি করে হাসতে হাসতে কতকগুলো মেয়ে এসে হাজির হলো সেখানে।

তার মধ্যে একটা মেয়ে খোঁনা গলায় বললে—চলুন বামুন ঠাকুর, বিয়ের সময় হয়েছে। তাদের গলার আওয়াজ শুনে আর আবভাব দেখে গোপাল বুঝলে এরা মানুষ নয়, প্রেতাত্মা। খুব ভয় পেয়ে গেল সে। কিন্তু গোপাল ঘাবড়াবার ছেলে নয়। সে সাহসে ভর করে বললে— দেখ, রাস্তা দিয়ে যখন তোমার লোকেরা আমাকে নিয়ে আসছিল, তখন পৈতেটা কোথায় পড়ে গেছে।

এই কথা শুনে একজন এগিয়ে এসে বললে—তাতে কি হয়েছে ঠাকুর মশায়। আমরা পৈতা এনে দিচ্ছি, আপনি তৈরী করে নিন।

গোপাল দেখলে কোন উপায় নেই, আজ আর পৈতৃক প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে হবে না। হায় হায়! কি ঝকমারী করতে বিয়ে দিতে এসেছিলুম রে বাবা! যদি প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারি, আর কখনও বিয়ে দিতে আসছি না।

গোপালকে ইতস্তত করতে দেখে, সর্দার ভূতটা হেঁড়ে গলায় বললে—কি ভাবছেন ঠাকুর মশায়! আমরা আপনার উচিত মত দক্ষিণা দেব। গোপাল মনে মনে ভাবতে লাগলো—যা দক্ষিণ পাচ্ছি, এতেই যথেষ্ট। এখন কোনরকমে প্রাণটা নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারলে বাঁচি ।

একটা মেয়ে বলে উঠল খোনা গলায়—কি হলো ঠাকুর মশায় চলুন। গোপাল বললে— হ্যাঁ বাবা, চল যাচ্ছি— এই বলে বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখে তো অবাক। বিয়ের যোগাড় সব মানুষের মতই তৈরী। বরণডালা, ছাদনাতলা, ফুলের মালা সব যোগাড়। কিন্তু আলো খুবই কম, কেমন যেন একটা আবছা অন্ধকার। কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। গোপাল দেখলে প্রাণ বঁচাতে গেলে এরা যা বলছে তাই করতে হবে। তা না হলে হয় ত মটাক করে ঘাড় মটকে দেবে। এই ভেবে সে সূতো দিয়ে একটা পৈতে তৈরী করে গলায় ঝুলিয়ে বসে গেল বিয়ে দিতে। ঠিক ঠিক মত কন্যা সম্প্রদান করালে, হস্তবন্ধনী, মালা-বদল করালে। মন্ত্র তো জানে না। কেবল অং ভং করে সারালে। বিয়ে হয়ে গেল, শাঁখ বেজে উঠলো পোঁ-পোঁ করে। গোপাল তখন পালাতে পারলে বাঁচে। তাই সে বললে –এবার আমায় দয়া করে ছেড়ে দাও বাবা।

সর্দার ভূত বললে—তাকি হয় ঠাকুর মশায়। খাওয়া দাওয়া সেরে, তারপর যাবেন।

গোপাল তখন তাড়াতাড়ি বললে—আমি হলুম সাত্বিক ব্রাহ্মণ। কারও বাড়ীতে জলগ্রহণ করি না, অতএব আমাকে ছেড়ে দাও।

—তাহলে আপনার দক্ষিণাটা নিন। এই বলে একটা ছোট থলে গোপালকে দিয়ে বললে,—এতে ৫০০ শত টাকা আছে, আর এই সোনার আংটিটা আপনি হাতে পরবেন। আমাদের কথা তাহলে মনে থাকবে।

গোপাল মনে মনে ভাবলে—খুব মনে থাকবে বাবা, হাড়ে হাড়ে মনে থাকবে। একবার পালাতে পারলে বাঁচি। তারপর প্রকাশ্যে বললে-আচ্ছা বাবা সব তাহলে আমি চলি । সর্দার ভূত বললে— কি করে যাবেন ঠাকুর মশায়?

গোপাল ভয় পেয়ে বললে—কেন? —সামনেই জলার ধারে শ্যাওড়া গাছে একটা শাঁকচুন্নী আছে। ওটা খুব পাজী। আপনাকে দেখলেই ঘাড় মটকাবে।

গোপাল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে— তাহলে উপায়?

—ভয় নেই। ঠাকুর মশায়! আমরা আপনাকে পৌছে দিচ্ছি। এই বলে সেই চারজনকে ডেকে সর্দার ভূত হুকুম দিলে—যা, ঠাকুর মশায়কে ভোর হবার আগে যেখান থেকে এনেছিস সেখানে রেখে আয়। সঙ্গে সঙ্গে চারজন ভূত গোপালের খাটিয়াখানা নিয়ে এলো, গোপাল আংটিটা আঙুলে পরে টাকার থলিটাকে ভাল ভাবে কাপড়ে বেঁধে খাটিয়ায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো।

চারজন ভূত সঙ্গে সঙ্গে খাটিয়া শুদ্ধ গোপালকে নিয়ে হাওয়ার বেগে এনে হাজির করলে নির্দিষ্ট জায়গায়। তারপর ভূত চারটে গোপালের পায়ের ধূলো নিয়ে বিদায় নিল। তখন ভোর হয়ে এসেছে। বাড়ীতে এসে গিন্নীকে সব কথা বলতেই গিন্নী বললে— বল কিগো! তাহলে তো তোমার লাভই হয়েছে। গোপাল হাসতে হাসতে বললে— নিশ্চয়। আমার নাম গোপাল ভাঁড়। লাভ ছাড়া লোকসান বুঝি না। এই বলে টাকার থলিটা গিন্নীর হাতে দিল।